বোতাম

(গল্পগ্রন্থ – মুখোশ ও মুখশ্রী)

আজকার ব্যাপারটি যা ঘটলো, তা আমার পক্ষে বেশ একটু আশ্চর্যজনক।

সাধারণত জীবনে এমন ঘটনা বেশি ঘটে না।

সেদিন বেলা দশটার সময় ছোকরার দল আমাকে এসে ধরলে, আদিবাসীদের নেত্রী এলিশাবা কুই আজ জেল থেকে মুক্তি পাবেন (কংগ্রেস গবর্নমেন্ট কার্যভার গ্রহণ করার পরদিনই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন এলিশাবা কুইকে মুক্তি দেওয়াই তাঁদের সর্বপ্রথম কাজ, এ সংবাদ খবরের কাগজ মারফত বিহারের অনেকেই অবগত আছেন), সেজন্য আমাকে মোটরটা দিতে হবে।

আমি জানতাম না এলিশাবা কুই রাঁচি জেলে আছেন। সানন্দে সম্মতি দিলাম, কিন্তু ওরাই যখন বেলা দুটোর সময় আমার কাছে এসে জানালে এবার মোটর দিতে হবে, তখন হঠাৎ আমার মনে পড়লো ড্রাইভার ছুটি চাওয়াতে তাকে ভুলে ছুটি দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং নিজেই মোটর চালিয়ে নিয়ে গেলাম জেলের ফটকে। বেলা দুটো বেজে দশ মিনিটের সময় এলিশাবা কুই জেলারের সঙ্গে গেটে দাঁড়ালেন। খুব বেশি ভিড় না হলেও খুব কম লোক যে এসেছিল তাও নয়। গণ্যমান্য লোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন, দু'তিনটি এম.এল.এ., বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা হরজীবন পাঠক, ধনী ব্যবসায়ী নেমিচাঁদ, বাঙালি বড় উকিল প্রভাত রায়, তাঁর জামাই ডাক্তার নীহার মিত্র ইত্যাদি। জনতা এগিয়ে গেল, এলিশাবা কুই-এর গলায় মালা দিয়ে তাঁকে আমার মোটরে নিয়ে এসে ওঠালে। একটু পরেই আমি মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমার বাড়ি হিনু ময়দানের কাছে, জগন্নাথপুরের রাস্তার খানিক এদিকে। জেল থেকে অনেকখানি চলে এলাম মোটর হাঁকিয়ে, সঙ্গে কেবল হরজীবন পাঠক ও দুটি ছোকরা কংগ্রেস কর্মী।

ওরা বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

বল্লাম—গরিবের বাড়িতে মাননীয়া নেত্রীর জন্যে ও আপনাদের জন্যে সামান্য একটু চায়ের জোগাড় করেছি—

একটি ছোকরা বল্লে—উনি তো চা খান না।

হেসে বল্লাম—জল খাবেন না হয় দয়া করে।

পেছনের সীটে দেশনেত্রীর মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

যাঁরা দেশনেত্রী এলিশাবা কুই-এর কথা শোনেনি বা ভালো জানেন না তাঁদের অবগতির জন্যে দু-একটা কথা ওঁর সম্বন্ধে বলি।

এলিশাবা রাঁচি ও সিংভূমের বন্য আদিবাসীদের নেত্রী। বাংলাদেশ বা অন্যস্থানে এঁর নাম তত কেউ হয়তো শোনেনি, কারণ বিহারের অনেক বিষয়েই বাংলার পাঠক উদাসীন। কিন্তু রাঁচি সিংভূম জেলার অধিবাসীদের কাছে এলিশাবা কুই-এর নাম ইন্দ্রজালের কাজ করে।

গত ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের সময় লোহারডগা থেকে যশপুর স্টেটের সীমান্ত পর্যন্ত পালামৌ জেলার সমগ্র বন্য অঞ্চলে দু'মাস কাল একটি স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হাত সেখানে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল—প্রত্যেকটি থানা, বাংলো, প্রত্যেকটি ফরেস্ট রেস্টহাউস এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কাছারি, থানা ও কর্মচারীদের থাকবার স্থানে পরিণত হয়েছিল। এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের নেত্রী ছিলেন এলিশাবা কুই।

লোহারডগা হতে বুন্‌জিগড় হয়ে যে বাস ঝার্সাগুডা ও সম্বলপুর যায়, তিনমাসকাল তাদের লাইসেন্স-পত্রে সই নিতে হয়েছিল এই স্বাধীন গবর্নমেন্টের কর্মচারীদের কাছেই। এই তিনমাস একটি চুরি হয়নি এ অঞ্চলে, একটি পয়সা ঘুষ নেয়নি কেউ।

১২ই অগাস্ট লোবরা অভ্রখনির মালিক মি. স্পীড প্রথমে খবর পান যে বিপ্লবীদল ছ'টা থানা পুড়িয়েচে, টেলিগ্রাফের তার কেটেছে, রাস্তায় ঘাঁটি বসিয়েচে, রাঁচী-লোহারডগা রেলপথ উপড়ে তুলে ফেলেছে, বন্য

গ্রামগুলিতে হো বা ওঁরাও মণ্ডলেরা নিজেদের হাতে শাসনভার নিয়েছে, অভ্রখনির আদিবাসী মজুরেরা কাজ বন্ধ করেচে এবং সম্ভবত তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে খুন করে ফেলবে।

এই ব্যাপারের বাকি অংশটুকু আমি মি. স্পীডের ম্যানেজার মি. শর্মার কাছে শুনেছিলাম। আমি নিজে রাঁচিতে অনেকদিন থেকে কনট্রাকটরি ব্যবসা করি, রাঁচি শহরে আমার আপিসও আছে, আমার বাড়ি গাড়ি সবই এই কনট্রাকটরি ব্যবসার দৌলতে। মি. স্পীডের খনিতে আমি মাঝে মাঝে জিনিসপত্র সরবরাহ করেছি, ওদের কোম্পানির নাম জন স্পীড অ্যান্ড কোম্পানি—অনেকগুলি অভ্র ও বক্সাইট খনির মালিক।

১২ই অগাস্ট সন্ধ্যাবেলা স্পীডের বাংলোতে খবর এল বহুলোক জড়ো হয়ে আসচে বাংলো পুড়িয়ে দিতে।। সাহেবের স্ত্রী ও দুই মেয়েও সে সময় বাংলোতে ছিল। রাত্রে বহু চেষ্টা করেও পালানোর ব্যবস্থা করা গেল না। সকালবেলা একটা লরি জোগাড় করে ওরা মালপত্র ওঠাচ্চে—আধঘণ্টার মধ্যেই লরি ছেড়ে বুনজিগড়ের পথে ওরা ঝার্সাগুডা বা সম্বলপুর পালাবে—এমন সময় দুজন একখানা মোটরে এসে নামলে—একজন সাহেবের হাতে একখানা চিঠি দিলে, তাতে কড়া হুকুম দেওয়া হয়েচে সাহেবকে, সে যেন স্থানত্যাগ করার চেষ্টা না করে, করলে বিপদে পড়বে পথে। যেখানে আছে সেখানে থাকলে সে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে, এর দায়িত্ব নিচ্চে পালামৌ কংগ্রেস সরকার। চিঠিতে সই আছে এলিশাবা কুই-এর।

লোক দুটি চিঠি দিয়েই মোটরে উঠে চলে গেল।

সাহেব ভয় পেয়ে লরি থেকে মালপত্র নামাতে লাগলো। যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মেমসাহেব কাঁদতে লাগলো। বড় মেয়েটি একটি রিভলভার নিয়ে বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইল।

ঠিক এই সময়ে মি. শর্মা আর একখানা লরি নিয়ে সেখানে হাজির। তিনি পাথরবাসা থেকে এই লরিখানা অনেক কষ্টে জোগাড় করে এনেছিলেন সাহেবদের যাওয়ার সুবিধের জন্যে।

মি. শর্মা অবাক হয়ে বল্লেন—একি, মালপত্র নামাচ্চেন কেন? যাবেন না?

সাহেব কিছু বলবার আগেই বড় মেয়েটি রাগের সুরে বল্লে—Oh,these black curs! Do you know what they have been up to?

—কি?

—Ask daddy—I am here to shoot them like pigs if they dare show their black faces.

—ঠাণ্ডা হও মিসি বাবা। তোমার বাবা কই? দাঁড়াও আগে শুনি—

মি. স্পীড বাইরে এসে হাতের চিঠিখানা নেড়ে মি. শর্মাকে বল্লে— Hallo Sharma, see this, these black Congress devils are at their dirty tricks even here—

—দেখি কি ব্যাপার?

—And see how ungrateful these black dogs are, we teach them, we make them what they are,we give them our Gospels and—see this black woman with a funny name from the Old Testament intimidating me as if she is the—

মি. শর্মা চিঠি পড়ে হেসে বল্লেন—এরা তো ভালোই বলচে। এলিশাবা কুই আদিবাসীদের নেত্রী। সেবার রামগড় কংগ্রেসে দেখেছিলাম। বেশ সুন্দর চেহারা। আদিবাসী হো, ওঁরাও, মুণ্ডা ও কোলেরা এঁকে বড্ড মানে। উনি ওদের জন্যে গ্রামে গ্রামে স্কুল করেচেন—হাতের কাজ শেখাচ্চেন—

—আর আমরা করিনি?

—করবে না কেন সাহেব, তোমরাও, মানে তোমাদের মিশনারিরা অনেক কিছু করেচে এদের জন্যে। কিন্তু একটা দোষ তোমরা করেচ বা মিশনারিরা করেচে—সেটা হচ্চে তাদের নিজের জাতি বা নিজের পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি একটা অশ্রদ্ধার ভাবও সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেচ তাদের মনে।

—তার মধ্যে খারাপ কি আছে? ভূতপুজো গাছপুজো ছাড়িয়ে আমরা ভালো করেচি না খারাপ করেচি? কি বলতে চাও তুমি?

—তারা বড় শালগাছ দেখে তার তলায় মারাং বোঙ্গা অর্থাৎ অরণ্যদেবতার পুজো করে—বড় পাহাড় দেখে তার তলায় জিয়াং বোঙ্গা অর্থাৎ পর্বত দেবতার—

—ফেটিশ ওয়ারশিপ—

—তোমার আমার পূর্বপুরুষও একদিন ফেটিশ ওয়ারশিপ করতে ছাড়েনি—বেদে তার প্রমাণ আছে—তোমাদেরও পুরানো দিনের ধর্মের মধ্যে তার প্রমাণ আছে সাহেব—ওসব কথা ছেড়ে দাও, এখন কি করতে চাও বলো—

—লরি রওনা করবো। কি করবে কংগ্রেস কুকুরেরা?

সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে একখানা লরি এসে দাঁড়ালো বাংলোর সামনে। লোকবোঝাই লরি, কংগ্রেসের পতাকা উড়ছে, জন-ত্রিশেক লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ফটক ঠেলে। মুখে তাদের 'বন্দেমাতরম' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি। সাহেব ও মি,শর্মার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। এবার এরা বোধ হয় সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাবে।

কিন্তু গাড়ি থেকে দলের পুরোভাগে নেমে এল একটি ছিপছিপে কালো তরুণী, খদ্দরের শাড়ি পরনে। খালি পা, হাতে একখানা মোটা খাতা। তরুণীটিকে দেখে বোঝা যায় সে হো বা মুণ্ডা জাতের মেয়ে। কিন্তু মুখখানা ও চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

মেয়েটি এসেই ইংরেজিতে সাহেবকে বল্লে—তুমিই মি.স্পীড? অভ্রখনির মালিক?

—হ্যাঁ।

—কোনো ভয় নেই। এখানে নির্ভয়ে থাকো। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করবে না। পথে অনেক ভয়। তোমাদের মেরে ফেললে তার দায়ী হবে না আমার গবর্নমেন্ট।

—তুমি কে জানতে পারি কি?

—আমি স্বাধীন পালামৌ আদিবাসী কংগ্রেস গবর্নমেন্টের প্রেসিডেন্ট। আমার নাম এলিশাবা কুই। ইস্তাহারে আমারই নাম আছে। পথে বেরুলে যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তার জন্যে আমার গবর্নমেন্ট দায়ী হবে না বলে রাখছি। তোমাদের ভালোর জন্যেই বলচি। শোনা না-শোনা তোমাদের খুশি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্পীড পরিবারের মেয়েরা এই ব্যাপার দেখছিল। ওরা যখন মোটরে উঠে চলে গেল, তখন সাহেবের বড় মেয়ে ঠোঁট উলটে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বল্লে—ফু! মাই গবর্নমেন্ট! সাহেব বল্লে—I ought to talk to this bully ram into her stupid noddle that she is a blockhead and a fool—

মি.শর্মা চুপ করে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, সাহেবদের কথা তাঁর ভালো লাগচে না। তিনি সবিনয়ে বুঝিয়ে বল্লেন, এখন বাংলো ছেড়ে পথে না বেরুলেই ভালো হবে। সত্যিই এ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়েচে। তিনি তার অনেক লক্ষণ দেখেচেন রাস্তায়-ঘাটে। সাহেব বল্লে—এখানে থাকলে কিছু হবে না?

—আমার তাই মনে হয়।

—ওদের কথায় বিশ্বাস কি?

—আমার মনে হয় ওদের কথায় বিশ্বাস করা যেতে পারে।

—আমাদের সঙ্গে তুমিও থাকবে এখানে?

—যদি বলেন থাকবো।

—পাথরবাসাতে কত টাকা মজুত?

—ন'হাজারের ওপর। ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। পথঘাট বন্ধ।

—টাকা এখানে নিয়ে এসো। চারটা বন্দুক এখানে।

—আনতে ভয় হয়। পথে টাকা নিয়ে বেরুতে পারবো না

—সাত মাইল রাস্তা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

—চলো আমি যাচ্ছি বন্দুক নিয়ে। টাকা আজই নিয়ে আসি।

—না সাহেব, তাতে বিপদ বেশি। আমি একা যাই। লোকজন কেউ কাজ করতে চাইচে না। প্রায় সবই তো পালিয়েচে। যারা আছে তাদেরও ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

মি. শর্মা পাথরবাসা খনিতে চলে যাবার পরে দু'দিন কেটে গেল, সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাপার কি, ম্যানেজার টাকা নিয়ে ভাগলো নাকি?

মেমসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে সাহেব বন্দুক নিয়ে নিজেই লরি চালিয়ে বেরিয়ে গেল—তিন মাইল দূর গিয়ে জঙ্গলের পথে দেখলে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মি. শর্মা হেঁটে আসছেন, সঙ্গে একজন লোক তাঁর সাইকেল ঠেলে নিয়ে আসচে, তাঁর চারিধারে ঘিরে সাত-আট জন কংগ্রেসী পুলিশ। সাহেব লরি থামিয়ে দিলে দলের সামনে। জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার মি. শর্মা?

মি. শর্মার ডানহাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটচেন। তিনি যা বল্লেন তার ভাবার্থ এই যে,পাথরবাসার কুলিদের সর্দার তাঁকে আক্রমণ করে টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তারা বলে, সাদা ভূতের রাজত্ব শেষ হয়েচে। ওদের টাকা এখন আমাদের। নাও টাকা কেড়ে। শেষ করে দাও এ কুকুরটাকে।

মি. শর্মা ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে হাতেপায়ে আঘাত পান। মারাই পড়তেন, ঠিক এই সময়ে এঁরা এসে পড়েন। তাই—

সাহেব বল্লে—এরা কে?

ওদের মধ্যে একজন সাহেবকে উত্তর দিল—কংগ্রেস বিদ্যুৎ-বাহিনীর লোক—

আর একজন বল্লে—আমাদের এলাকার মধ্যে কোনো অরাজকতা হতে দেবো না—

সাহেব বল্লে—টাকা ঠিক আছে মি. শর্মা?

—পাইপয়সা।

মি. শর্মা খুব ভালো আর প্রভুভক্ত লোক। সাহেব তাঁকে বিশ্বাসও করতো যথেষ্ট, কিন্তু এসময় শুধু বিশ্বাস নয়, ওঁর ওপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে হয়েছিল সাহেবকে। কোনো দিক থেকে একটা আলু কি এক ছটাক চালও জোগাড় করা সম্ভব হত না মি.শর্মার সাহায্য ছাড়া। সমস্ত জনমজুর চলে গেল, মোটরের ড্রাইভার চলে গেল, মেমসাহেব ও তার দুই মেয়ে নিজেরা বড় বড় তিনটে মুলতানী গরুকে বিচিলি কেটে খাইয়েচে, নিজেরা দুধ দুয়েচে—নয়তো গরুগুলো ওই ধাক্কাতে না খেয়েই মারা পড়তো।

একমাস। দু'মাস।

তারপর সব ঠিক হয়ে গেল।

এলিশাবা কুই ধরা পড়লেন বাগুন্ডার ঘাটোয়ালী কাছারিতে। দলবল কিছু পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারালো, কিছু সুন্দরগড় স্টেটের অরণ্যভূভাগে গা-ঢাকা দিলে।

সেই এলিশাবা কুই।

আমার বাংলোর সামনেই মোটর থামিয়ে ওঁকে এবং বাকি সকলকে নামতে অনুরোধ করলাম। কিছু না, সামান্য একটু চা। আমার বাড়িতে অনেকগুলি মেয়ে এসে জুটেছিলেন এলিশাবা কুই দেখবার জন্যে। শাঁখ বাজলো, হুলু পড়লো, খই ও ফুল ছড়ানো হল। তারপর মেয়েরা হাত ধরে ওঁকে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

জনৈক কংগ্রেস কর্মী বল্লেন – বেশিক্ষণ দেরি করতে পারা যাবে না মশাই, পাঁচটায় আমাদের মিটিং আছে—ওঁকে নিয়ে যেতে হবে।

—যত শিগগির হয় ছেড়ে দেওয়া হবে।

—একটু বুঝিয়ে বলুন মেয়েদের—

—এখন যতই বুঝিয়ে বলি ফল হবে না। কিছু সময় যাক—

বাইরের লোকদের চা-পর্ব মিটে গেল। আধঘণ্টা সময় কাটলো। আবার ওঁরা ধরলেন—আপনি একবার অন্দরে যান মশাই, আমরা আর বিলম্ব করতে পারবো না।

আমারও আর ইচ্ছে নেই দেরি করাবার। বাড়ির সামনে লোকের ভিড় যেন ক্রমশ জমচে।

আমি অন্দরের দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যকে উদ্দেশ্য করে হেঁকে বল্লাম—কই, হল? ইদিকে এঁরা তাড়াতাড়ি করচেন।

কোনো উত্তর নেই।

বহু মহিলাকণ্ঠের সম্মিলিত কলরবে অন্দর সরগরম, কে কার কথা শোনে?

অসহায়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বল্লাম—ইয়ে—এঁরা বড় ব্যস্ত হয়েচেন—একটু তাড়াতাড়ি!

ষোলো-আঠারো বছরের একটি কুমারী মেয়ে এসে বল্লে—কি বলচেন?

—ওঁকে একটু ডেকে—তুমি কোন্ বাড়ির মেয়ে চিনতে পারলাম না তো—

—আমি রজনীবাবুর ভাইঝি—

—ও, তুমিই কলেজে পড়ো?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ। মাঝে মাঝে এসো। তা ওঁকে একটু ডেকে দিতে হচ্চে—এত দেরি হচ্ছে কেন?

সবাই অটোগ্রাফ নিচ্চে যে। আবার বাণী চাইচে। বিশ-পঁচিশটি কলেজের মেয়েই তো এসেচে—ওই আসচেন—

বলেই মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে সসম্ভ্রমে একপাশে দাঁড়ালো। এলিশাবা কুই আগে আগে হাসিমুখে, পেছনে নারীবাহিনী। এই আমি প্রথম ভালো করে এলিশাবা কুইকে দেখলাম। এতক্ষণ ব্যস্ততায়, উত্তেজনায় ও ভিড়ে আমি ভালো করে ওঁর মুখ দেখবার সুযোগই পাইনি।

আমি চমকে উঠি। হঠাৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে যাই। খুব আশ্চর্য হয়ে যাই।

আমার একেবারে সামনে যখন উনি এসেচেন, তখন আমি বল্লাম হিন্দিতে—দয়া করে আসুন বাইরে। বড় তাড়াতাড়ি করচেন ওঁরা।

এলিশাবা কুইয়ের মুখশ্রী অতি সুন্দর। এদেশের আদিবাসিনী বন্য রমণীদের সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও শান্তপেলব লাবণ্যমাখা মুখশ্রী এখনো ওঁর বজায় আছে। উনিও এই সময় আমার দিকে চাইলেন। একটু বেশিক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। পেছনে মেয়েদের ভিড়। কিছু বলবার সুযোগ হল না। বাইরে নিয়ে এসে মোটরে ওঠবার সময় সুযোগ ঘটলো মিনিটখানেকের জন্যে। বল্লাম—বলিবায় ছিলেন?বলিবার জঙ্গলে?

উনি চমকে উঠলেন! আমার দিকে ভালো করে চাইলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় ও সংশয় মাখানো।

বল্লাম—তাহলে আপনিই সেই! মনে পড়েচে?

উনি আশ্চর্য হওয়ার সুরে বল্লেন—আপনি?

কথা সবই হিন্দিতে।

বল্লাম-চিনেচেন? মনে পড়ে সেই ওভারসিয়ার নিকোডিম কারকাট্টা?

—হ্যাঁ।

—কাজ সেরে আসুন, সন্দেবেলা কথা কইবো অনেক।

—সেই ভালো।

সবাই ওঁকে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এলিশাবা কুই! এলিশাবা কুই! কি আশ্চর্য—শুধু বসে বসে ভাবি। এলিশাবা কুই তো নয়, ওর নাম চম্পু! কি আশ্চর্য লাগচে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা!

কুড়ি বছর আগের কথা।

আমি তখন সবে বছর দুই হল ময়নামতী সার্ভে স্কুল থেকে পাশ করে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে বাইরে বেরিয়েছি।

আমার বয়েস বাইশ-তেইশ। 'পি.ডবলিউ.ডি'র সামান্য চাকরি করি।

বলিবা থেকে কামারবেড়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরি হচ্ছিল ঘন সারান্ডা অরণ্যের মধ্যে দিয়ে।

বলিবা একটি বন গ্রামের নাম, লোকসংখ্যা হয়তো ছিল পঞ্চাশ কি তেষট্টি, গুনে দেখিনি কখনো। তবে ওই রকমই হবে। গ্রামের সামনে পাহাড়, ডাইনে-বাঁয়েও পাহাড়, পেছনে গভীর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে যে সামান্য সমতল জমি, তাতেই গ্রামের লোকে ভুট্টা, জনার, শকরকন্দ আলু, টক পালং ও টোমাটোর চাষ করে।

আজ বেশ স্পষ্ট মনে হচ্ছে বলিবা গ্রামের ছবি। প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় কর্মস্থল। তারপর এই কুড়ি বছরে কত জায়গা দেখলাম, সামান্য রোড্‌সার্ভেয়ার থেকে এখন আমি একজন ধনী কনট্রাক্টর, কত কি ঘটে গেল জীবনে। কত অসম্ভব সম্ভব হল। কিন্তু বলিবা গ্রামের কথা, তার সেই মাকা হো'র পেঁপেবাগান, ছোট্ট উসুরিয়া ঝরনার কলকল জলস্রোত, বোঙ্গা পুজোর প্রকাণ্ড জগহরি শাল গাছটা, সন্ধ্যাবেলায় মাকা হো'র উঠানের পুরু শালকাঠের পালিশবিহীন, অসমতল বেঞ্চিতে বসে চা-পান ও গল্প—কখনো ভুলবো এসব?

বলিবা গ্রামে প্রথমে আমার বাসস্থান ছিল না। বলিবা-কামারবেড়া রাস্তা জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছিল বন-বিভাগ থেকে। তাঁদের কর্মচারীরা 'পি.ডবলিউ.ডি'র কাছে আমাকে হাওলাত চান রাস্তা করবার সময়। তিন মাসের জন্যে আমাকে হাওলাতে দেওয়া মঞ্জুর করা হয়। সেই সূত্রেই আমাকে যেতে হয়েছিল এবং এগারো মাইল দূরবর্তী জেরাইকেলা থেকে সাইকেলযোগে এসে রোজ কাজ করতাম। সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গেল। রাস্তা তৈরি আরম্ভ হল। তবুও আমাকে যেতে হত, কতখানি হয়েচে সেটা তদারক করতে।

ভীষণ জঙ্গল। বড় বড় গাছ পড়েছিল রাস্তার জন্যে নির্দিষ্ট জমিতে। কুলিতে গাছ কাটছিল, পাহাড়ের গা কাটছিল রাস্তা বের করতে, বড় বড় পাথরের চাঁই রাস্তায় এসে পড়ছিল, হো কুলি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাথর ও মাটি বইছিল।

সে জঙ্গলে বুনো হাতি ও বাঘ ঘোরে রাত্রে। আমাদের নতুন তৈরি রাস্তার ওপর বুনোহাতির পায়ের দাগ। কি বিরাট শাল গাছ এক-একটা। দেড়শো দুশো বছরের পুরানো। কুলি ও কুলিনীরা না বোঝে বাংলা, না বোঝে হিন্দি। হো ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। খাবার কিছু মেলে না, কেবলই মকাই আর জনার।

একজন ওভারসিয়ার ছিল হো খ্রিস্টান, নাম নিকোডিম কারকাট্টা। লোকটা বনবিভাগের কর্মচারী, রাস্তার কুলিদের কাজ তদারক করতো আর কুলিদের প্রতি কি গালমন্দ মারধর করতো! মেয়ে-কুলিদের ওপরও এইরকম করচে দেখে একদিন আমার ভারি রাগ হল। সে কি অকথ্য ভাষায় গালাগাল, চাবুক উঁচিয়ে মারতে যায় মেয়েদের, পাথরের ঝুড়ি বইছে মাথায় নিয়ে, দিলে সজোরে ধাক্কা, ঝুড়িসুদ্ধ ছিটকে পড়ে গেল একটি মেয়ে কুলি।

আমি বল্লাম—ও কি হচ্ছে?

নিকোডিম রেগে উঠে বল্লে—কি?

—কি দেখতে পাচ্চ না? মেয়েদের অমন করে ধাক্কা দেয়? ছিঃ!

—ওরা কাজ করচে না।

—তা বলে তুমি মারবে ওদের?

যে মেয়েটিকে ধাক্কা মারা হয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়ছিল, নিকোডিমের ভয়ে সবাই সেখানে জুজু, কারো কিছু বলবার সাহস নেই। আমি যখন নিকোডিমকে তিরস্কার করছি, তখন অন্য সকলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল। আমার বকুনি খেয়ে নিকোডিম সেখান থেকে এগিয়ে পাহাড়র নীচে রাস্তার
ও-বাঁকে চলে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু তখুনি মিটলো না। নিকোডিম সেদিন থেকে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। ওসব জঙ্গলের মধ্যে ওদের সাহায্য ভিন্ন খাবার জোগাড় করা মুশকিল। ও গ্রামে বারণ করে দিলে—আমি দুধ পাইনে, ডিম পাইনে। বন-বিভাগের কর্মচারীদের জন্যে বলিবা গ্রামে গবর্নমেন্টের তৈরি ঘর আছে। সেখানে যাতে আমি রাত্রে আশ্রয় না পাই, তার ব্যবস্থাও করলে। ফলে এই দাঁড়ালো কাজ করতে করতে যদি বেলা যেত, সূর্য অস্ত যাবার জোগাড় করতো পশ্চিমের বন-পাহাড়ের ওপারে—আমায় সাইকেলে ফিরতেই হত বন্যজন্তু-অধ্যুষিত বনপথ ধরে এগারো মাইল দূরবর্তী জেরাইকেলায়। আশ্রয় বা খাদ্য কিছুতেই মিলতো না নিকটে কোথায়ও।

আমার ভয় করতো না বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। সাত মাইল দূরে কেরুকোচা নালার ধারে বেলা একদম পড়ে আসতো, অন্ধকার দেখাতো পাহাড়ি ঢালুর ঘন শালজঙ্গল। বড় বড় আসান গাছগুলো দেখাতো ভূতের মতো, শুকনো পাতার শব্দ শুনলে মনে হত বাঘ বেরিয়েচে, প্রত্যেক বাঁকে মনে হত আধ-অন্ধকারে বুনো হাতি রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে—সাইকেলের সঙ্গে তাল লাগাবে বুঝি—তবুও যেতে হয়েচে বাধ্য হয়ে।

একদিন সম্বর হরিণের একটা দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর দেখতাম বন-মোরগ ঝটপট করে সামনের রাস্তার ওপর থেকে উড়ে গেল; দেখতাম ময়ূর রাস্তা পার হয়ে এদিকের বন থেকে ওদিকের বনে যাচ্ছে। দেখতাম দু'-একটা কোতরা সরু সরু পায়ে ভর দিয়ে পালাচ্ছে, কিন্তু কোনো হিংস্র জানোয়ার চোখে পড়েনি।

দিন পনেরো কাটলো।...

দুপুরবেলা একদিন পাহাড়ের নীচে তেপায়ার ওপর টেবিল বসিয়ে জরিপের নক্সা দেখচি, এমন সময়ে কোথাথেকে একখানা পাথর গড়িয়ে এসে পায়ে বিষম চোট লাগালো। দুটো আঙুল ছেঁচে রক্ত পড়তে লাগলো। আমি দু'হাতে পা চেপে ধরে তখুনি বসে পড়লাম—দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না।

কিছুদূরে কুলিরা কাজ করছিল, ওরা ছুটে এল। ওদের মধ্যে একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে আমার পা বেঁধে দিলে। আমি সেখান থেকে উঠতেই পারলাম না, যখন অতি কষ্টে উঠলাম তখন দেখি সাইকেল চালিয়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়েছি।

বেলা গেল, সূর্য ঢলে পড়লো বনের ওপারে। সেটা ছিল মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শীতও তেমনি নামলো সেদিন সূর্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মহাবিপদে পড়ে গেলাম। কুলির দল তো আর একটু পড়েই পালাবে। বনবিভাগের লোকেরা আমাকে সহানুভূতির চোখে দেখে না নিকোডিমের ভয়ে। ওদের তাঁবুতে আমার প্রবেশ নিষেধ—আমি এখন যাই কোথায়?

কুলিরা কাজ শেষ করে দলে দলে পাহাড়ের ওপরের রাস্তা বেয়ে বলিবা গ্রামের দিকে চললো। আমার অবস্থা কি তা অনেকেই জানে না। কাকে বা বোঝাই, কি বা বলি? হো ভাষা তেমন আয়ত্ত করতে পারিনি দু'একটি কথা ছাড়া।

এমন সময়ে সেই কুলির দল আমার সামনে দিয়ে নীচে থেকে ওপরে উঠচে। কাজ করতে করতে ওরা রাস্তার নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল। আমার কাছে যখন দলটি পৌঁচেছে, তখন একটি মেয়ে দল ছেড়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলাম ওর দিকে, এই মেয়েটিই আমার পায়ে ওর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। আরো আমার মনে হল নিকোডিম সেদিন একেই ধাক্কা মেরেছিল। যখন ও আমার পায়ে ওর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বাঁধে, তখন যন্ত্রণার চোটে কারো মুখ ভালো করে দেখবার অবস্থা ছিল না আমার। তখন চিনিনি।

ও বল্লে-জুম্ পে?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম, বুঝিনে ও কথা। হাত দিয়ে দেখালাম পায়ের ঘা। ওর মুখের দিকে চেয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আমি সাইকেলে উঠতে পারবো না। পায়ে ব্যথা।

এতদিন পরেও একটা কথা আমার মনে আছে, মেয়েটির বড় বড় কালো চোখের সে অদ্ভুত স্নেহ ও সহানুভূতি ভরা চাউনি। সে-চাউনি কখনো ভুলবো না। আমি এদের কাছে আশা করিনি এরকম চাউনি। কেননা বাংলাদেশ থেকে নতুন এসেছিলাম, বন্য জাতিরা মানুষই না, ওসব একরকম কিম্ভুতকিমাকার জীব—এই ছিল আমার ধারণা ওদের সম্বন্ধে। তাদেরই একটি মেয়ের চোখের চাউনির মধ্যে দিয়ে আমারই মা বোন উঁকি মারবেন, একেবারে সুস্পষ্ট ভাবেই উঁকি মারবেন—দেখবার আগে সে বিশ্বাস আমার হত না।

আমি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার চেয়েও বিস্মিত হবার কারণ ঘটলো যখন সে এসে আমার হাত ধরে তুলবার চেষ্টা করে বল্লে—নাকি ওকু দিইসানা, জুম্ পে?

আমি ঠেলে উঠলাম—দাঁড়ালাম অতি কষ্টে।

কি বলচে মেয়েটি? কি একটা প্রশ্নের সুর ওর কথায়। কি প্রশ্ন? ঘাড় নেড়ে বোঝালাম বুঝি না ওর কথা।

তারপর মেয়েটি যা করলে, তা যে কত বিস্ময়কর হয়েছিল তখন আমার কাছে! মেয়েদের কি বল্লে ও। আমার চারিপাশ ঘিরে ওরা দাঁড়ালো এসে। দু'তিনজনে শক্ত করে আমার বগল ও হাত ধরলে। মেয়েটিও ধরেচে ডান হাত। চল্লাম ওদের সঙ্গে। আমাদের পেছনে পেছনে একটি মেয়ে সাইকেলখানা ঠেলে নিয়ে আসতে লাগলো।

জঙ্গলের ধারে বলিবা গ্রামের একটি ঘরে ওরা আমায় নিয়ে এল। পরে গৃহস্বামীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার নাম মাকা হো, বলিবা গ্রামের মণ্ডল। শালকাঠের খুঁটি ও আড়ালাগানো একখানা কুঁড়েঘর—না তার জানালা, না দরজা—ঘরের সামনে শালকাঠের তক্তা সোজা করে পুঁতে বেড়া দেওয়া। ওরকম ঘরে কখনো বাস

করিনি। তেমনি শীত এখন এই বনের মধ্যেকার গ্রামে। চীহড় লতার ছালের দড়ি দিয়ে ছাওয়া একখানা খাটিয়াতে ঘরের চরখা-কাটা মোটা সুতো দিয়ে বোনা একখানা চাদর পেতে দিলে, শতরঞ্জির মতো পুরু।

সেই মেয়েটি আমায় শুইয়ে রেখে চলে গেল। সবাই চলে গেল।

আমি একা ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে শালকাঠের মোটা মোটা আড়া লক্ষ করতে লাগলাম। সেই জন্যে শালকাঠের আড়ার কথা আমার বড় মনে আছে। অসহায় অবস্থায় চুপ করে শুয়ে আছি দূর এক বন্য গ্রামে, বন্য জাতিদের মধ্যে। কি আমার উপায় হবে এখানে, কি করি এখন—এমন সতেরো হাত জলের তলায় পড়ে যাবো বিদেশে এসে তা কখনো ভাবিনি। ভয়ও হল, এ ঘরে তো দরজা নেই, নিকটেই বন, গভীর রাত্রে বাঘ ভালুক ঘরে ঢুকবে না তো? প্রায় দু'ঘন্টা কেটে গেল। অন্ধকারেই শুয়ে আছি। বাইরে কিন্তু চাঁদনী রাত, তবে শুক্লপক্ষের প্রথম দিক, জ্যোৎস্নার তেমন জোর নেই। আকাশে মেঘ হওয়ার জন্যেও সেটা হতে পারে—আমার ততটা মনে নেই।

হঠাৎ দোর দিয়ে কে ঘরে ঢুকলো, কবাটহীন দোর, যে কেউ যেতে-আসতে পারে।

চমকে বাংলায় বল্লাম—কে?

মৃদু নারীকণ্ঠে উত্তর দিল—চম্পু—

মেয়েটি আমার ভাষা বোঝেনি। কিন্তু আমার প্রশ্নের সুরে স্বভাবতই তার মনে হয়েচে ঘরে কে ঢুকলো তাই আমি জিজ্ঞেস করচি, সুতরাং সে তার নাম বলেচে।

এই প্রশ্নোত্তরের অভিনবত্বের জন্যেই চম্পু নামটা হঠাৎ এমন মিষ্টি লাগলো। অনার্য নাম নয় বলেও বোধ হয়। কারণ আমি জানি ও অঞ্চলে মেয়েদের নামের মধ্যে কমনীয়তা খুঁজতে গেলে বড্ড নিরাশ হতে হবে।

ভাষা জানি নে, সুতরাং চম্পু নামটার ওপরই একটি সম্পূর্ণ বাক্যের জোর দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম—চম্পু?

—হোই।

অর্থাৎ 'হ্যাঁ'।

—খিদে পেয়েছে—

সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত দিয়ে খাওয়ার অভিনয় করলাম। মেয়েটি হেসে ঘর থেকে বার হয়ে গেল এবং আধঘন্টাটাক পরে কতকগুলো শকরকন্দ আলুসিদ্ধ শালপাতায় জড়িয়ে নিয়ে এল। চা খাবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই মেয়েটিকে তা বোঝানো আমার দুঃসাধ্য-জ্ঞানে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

মেয়েটি তখন চলে গেল। আবার আধঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকলো, শালকাঠের আগুন জ্বালিয়ে দিলে ঘরের ঠিক মাঝখানে। ছোট একখানা তুলোর লেপ আমায় দিয়ে গেল রাত্রে গায়ে দেবার জন্যে।

আমি প্রশ্নের সুরে বল্লাম—চম্পু?

একটিমাত্র কথাই জানি, যতক্ষণ এবং যত রকম ভাবে সম্ভব সেই কথার সদ্ব্যবহার করি।

মেয়েটি একবার হেসে ফেল্লে আমার সামনেই। বলে— হোই।

আমার হো ভাষার দৌড় বোধ হয় বুঝতে পেরেচে।

ঘরে আগুন জ্বললে আমি চম্পুকে ভালো করে দেখতে পেলাম। এ সেই মেয়েটি, যাকে নিকোডিম ধাক্কা মেরেছিল। বেশি ওর বয়েস নয়, পনেরো-ষোলোর বেশি হবে না, সুন্দর মুখশ্রী। এই বন্য দেশে এমন মেয়ে আছে জানতাম না। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—বাংলাদেশের যে কোনো স্কুল-কলেজের মেয়ের মতো।

একটু পরে মাকা হো ঘরে ঢুকলো। পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে বয়েস, এখনো দিব্যি সবল। মাকা হো ঘরে ঢুকেই হিন্দিতে বল্লে—কেমন আছ?

আমি মহা খুশি হয়ে বল্লাম—বাঁচলাম। হিন্দি জানো দেখছি—

—বাংলা ভি জানে। কিছুটা বুঝচে।

—বাঃ বাঃ—বেঁচে থাকো। নাম কি তোমার?

—মাকা হো —

—এ গ্রামের নাম কি?

—বলিবা আছে।

—শোনো মাকা হো, তোমাকে বাংলা শেখাই ভালো করে। এখানে 'আছে' অনাবশ্যক ক্রিয়াপদ! শুধু 'বলিবা' বল্লেই হল—বুঝলে? এরপর ওরকম আর বলবে না।

মাকা হো আমার বৈয়াকরণিক আলোচনা বুঝলে না। না বুঝেই বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়তে লাগলো।

হিন্দিতে বল্লাম—চম্পু তোমার মেয়ে?

—না। ওর কেউ নেই কেবল এক বুড়ি দিদিমা ছাড়া। এ গাঁয়ে ওদের বাড়িও নয়। করমপদা থেকে এসেচে।

—বড় ভালো মেয়ে।

—সবাই ওকে ভালো বলে।

চম্পু মাকা হোকে কি বল্লে। মাকা আমার দিকে চেয়ে বল্লে—চম্পু বলচে এ গাঁয়ে তোমাকে কিছুদিন থাকতে হবে।

—ওকে বলো, এখানে দেখবে কে?

—চম্পু বলচে, ও দেখবে।

—আমাকে রেঁধে খাওয়াবে?

—বলচে যা কিছু দরকার সব করবে। শোনো তোমায় বলচে এখন ঘুমিয়ে পড়ো। আমরা যাই। কাল সকালে তোমার পায়ে ওষুধ বেটে দেবে বলচে।

—আমি চম্পুকে ধন্যবাদ দিচ্চি। ও আমার বোনের মতো।

—ও বলচে, তুমিই ওকে নিকোডিমের হাত থেকে বাঁচিয়েচ।

—বলো, সে আমার কর্তব্য কাজ। করা উচিত তাই করেচি।

—চম্পু বলচে, কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার পা ও সারিয়ে দেবে। তুমি যতদিন সেরে না ওঠো, নির্ভাবনায় এখানে থাকো। তোমার কর্তব্য তুমি করেচ, ওর কর্তব্য ও করবে।

সেই রাত্রিটির কথা আজও ভুলিনি। ওরা চলে গেল। আমি একা শুয়ে রইলাম। নতুন জায়গা, বনের মধ্যে গ্রাম। দরজার কপাট নেই। নানারকম শব্দ বনের মধ্যে সারা রাত, গ্রামের অদূরেই নিবিড় অরণ্য। বন্যকুক্কুটের ডাক শুনচি, কোতরা ডাকছে, ঘুম আর আমার আসে না। ঘরের পেছনে খস্‌খস্‌ শব্দ হয়, আমি অমনি চমকে উঠে ভাবি এ বোধ হয় ভালুকের পায়ের শব্দ। গভীর রাত্রে দূরে দূরে কোথায় বন্যহস্তীর বৃংহিত কানে গেল। কত রকম ভয়ে সে রাত কাটলো—ঘুমিয়ে পড়লাম একেবারে ভোরবেলা। জেগে উঠে দেখি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়েচে, চম্পু এসে ডেকে উঠিয়েচে, বিছানার পাশেই সে দাঁড়িয়ে, হাতে ওষুধ বাটা।

ও আমার পা বেশ ভালো করে টিপে টিপে দেখলে। একবার জোর করে টিপতে আমি যন্ত্রণায় 'উঃ' করে উঠলাম। আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে-জুম্ পে?

পরে জেনেছিলাম এর মানে—পায়ে লাগচে?

আমি ঘাড় নেড়ে বল্লাম—ও বুঝিনে।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম মুখ ধোয়ার জল আনতে। চম্পু জল নিয়ে এল। নতুন ওষুধ বাটা আমার পায়ে লাগিয়ে দিলে এবং একটা জামবাটিতে কি একটা জিনিস আনলে, শালপাতা দিয়ে ঢাকা।

হাত দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম —কি ওতে?

—মান্তি।

তার মানে বুঝলাম না।—দেখি বাটি নিয়ে এসো—

চম্পু আমার ইঙ্গিত বুঝে বাটি নিয়ে এল ও হরি—এক বাটি ভাত! আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লাম—মান্তি?

চম্পু হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি। সে আমার ভাষাজ্ঞানের দৌড় বুঝে নিয়েচে। হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে বল্লে—হোই। এইভাবে ও আমার মনের ভাব আন্দাজে বুঝে নিত, আমি বুঝে নিতাম ওর।

সেই ঘরে কেটেছিল দশ দিন। চম্পু কি সেবাটাই করেছিল এই দশদিন। ভাষা না বুঝলেও আমি ওর ভালোবাসা বুঝতাম, নয়নের স্নেহদৃষ্টি বুঝতাম। আমি ওর হাত দুটি ধরে একবার আবেগের মাথায় বলেছিলাম— চিরকাল মনে থাকবে তোমার কথা চম্পু। কখনো ভুলবো না তোমায়।

চম্পু কিছু চায়নি আমার কাছে। যা করেছিল, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। এমনি দুর্লভ মন ছিল ওর। আমিও তখন গরিব, তবুও আসবার দিন সাইকেলে ওঠবার সময় ওকে আমার হাতঘড়িটা দিতে গিয়েছিলাম, ও নেয়নি। আমার জামার বোতাম দেখিয়ে বল্লে—ওটা দেবে? মাকা হোকে বল্লাম—বুঝিয়েদাও, এ সোনার নয়, পেতলের ওপর গিল্টি করা। এর দাম ছ'আনা পয়সা। এ নিয়ে কি হবে?

চম্পু শুনলে না, বল্লে—না, বোতাম নেবো।

সরলা হো বালিকা। যা চায় তাই দিলাম, ছ'আনা পয়সার চারটি পেতলের বোতাম। অনেক দিনের কথা হয়ে গেল সে-সব। মধ্যে অবস্থা যখন দিনকতক খুবই খারাপ হয়ে গেল, রাস্তার কনট্রাক্টরি করতে গিয়ে গরবাই-নালার সিমেন্টের সেতু দু-দুবার জলের তোড়ে ভেঙে গেল, সাড়ে তিন হাজার টাকা আমার পুঁজি থেকে বেরিয়ে গেল, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো পাওনাদারদের অত্যাচারে—তখন সামনে দেখলাম সর্বস্বান্ত হওয়ার পথ জেলের ফটক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েচে—কতবার তখন ভেবেচি, সব ফেলে পালিয়ে যাবো বলিবা গ্রামে মাকা হো'র বাড়ি। সেই ঘন অরণ্যে শালফুলের আলস্য-মাখানো দিনগুলিতে চম্পু হো'র সঙ্গে নীরব ভাষার কথোপকথন, সেই নির্জন রাত্রিগুলির নিবিড় মোহ।...

বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল।

বাড়ি গাড়ি করেছিলাম, বড়লোক হয়েছিলাম।

চম্পুর দেখা পাইনি, আজকার দিনটি ছাড়া।

কিন্তু এ কোন্ চম্পু? এ ইংরেজি বলে, মোটর চড়ে, সভায় হিন্দিতে বক্তৃতা দেয়। সেই সরলাবালাকে এর মধ্যে কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তবুও উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম সন্ধ্যার জন্যে।

এলিশাবা কুই এলেন সন্ধ্যার একটু পরে। কেউ ছিল না ঘরে।

বল্লাম—মনে পড়ে?

হেসে বল্লে—সব।

—চম্পু তোমার কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি জানি তাই, না জানলে অবিশ্বাস করতাম। কি করে এমন হলে? বলিবা ছাড়লে কেন? লেখাপড়া শিখলে কোথায়?

দশ মিনিটের জন্যে এসেছি, অন্য সময় শুনবে। মিশনারি স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করি। আমাদের গ্রামের হো পাদ্রী আমাকে রাঁচি নিয়ে যায়। মাকা মারা গেল, কেউ ছিল না গাঁয়ে, কে আশ্রয় দেয়? রাঁচিতে বল্লে, খ্রিস্টান হলে সব সুবিধে করে দেবে। সত্যি বলচি, এখন এসব ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করে বলিবা গাঁয়ে। অগাস্ট আন্দোলনের পরে জেলে বসে বসে শুধু বলিবার কথাই ভাবতাম।

—আর কোনো কথা মনে পড়তো না?

চম্পু কৃত্রিম রাগের—সুরেবল্লে না। কি কথা মনে পড়বে? মান রেখে কথা বলতে শেখো—জানো আমি কে?

আমি পাল্টা রাগের সুরে বল্লাম—বেশ। দাও আমার বোতাম ফেরত—

চম্পু খিলখিল করে হেসে বল্লে—কাল আসবো। মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছুতো করে এসেছি।

—তারপর একটু থেমে বল্লে -বোতাম নিয়ে আসবো, হারাইনি।